সম্পর্ক রক্ষার দায় কি শুধুই নারীর?

নাদিয়া নাহরিন রহমান

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের নেপথ্যে কাজ করে প্রাকৃতিক প্রণোদনা, যা খুবই সহজাত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এটি বিভিন্ন রীতি ও প্রথামাফিক চর্চিত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে রয়েছে ধর্মীয় বিধি-বিধানও। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক যুগেও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সম্পর্ক স্বাভাবিক এবং সেই সুবাদে সম্পর্কের সমাজস্বীকৃত রূপ পরিবার কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেটা দুজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের জন্য যেমন, তেমনি প্রজন্মের ধারাবাহিকতা বহমান রাখার মাধ্যমে সামাজিক জীবনের জন্যও। আমরা স্থান, কাল এবং লিঙ্গভেদে এই সম্পর্কের নানা প্রকারভেদ দেখতে পাই।

আমরা এখানে দুজন স্বনির্ভর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সম্পর্ককে ইঙ্গিত করছি, যেখানে উভয়েই উভয়ের সমকক্ষীয় এবং যেখানে 'পার্টনারশিপ' কথাটি প্রযোজ্য। আর্থিক, লৈঙ্গিক পেশিশক্তিনির্ভর প্রভাব খাটিয়ে একপক্ষ অপরপক্ষের যাপিত জীবনে কর্তৃত্ব আরোপ করবে না বা কোনো নেতিবাচক প্রভাব খাটাবে না। ফরাসি উত্তর আধুনিকতাবাদী দার্শনিক মিশেল ফুকো একে সংজ্ঞায়িত করে গেছেন 'ডিসকোর্স' বা ভাষার বলয়ের মাধ্যমে। এই বলয় যে সব সময় ভাষার মধ্যেই সীমিত থাকবে তা কিন্তু নয়। এই প্রভাব বা 'পাওয়ার' চর্চার বিষয়টি প্রযোজ্য হতে পারে নানা উপায়ে; যেমন হতে পারে কর্মস্থলে বিনা বাক্যব্যয়ে বিভাগীয় প্রধানের আদেশ পালন করার মাধ্যমে কিংবা নারীর পোশাকের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ কিংবা পুরুষ সঙ্গী কিংবা স্বামীর ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী নারীর পেশা নির্বাচনের মাধ্যমে। তাতে 'পার্টনারশিপ' ধারণাটিই মূল ভাবার্থ থেকে সরে আসতে থাকে সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল প্রভাব বা 'ডমিনেন্স'-এর মাধ্যমে। তখন স্বামী-স্ত্রী বা কপোত-কপোতীর সম্পর্কটা আবদ্ধ হয়ে পড়ে ফুকোকথিত ডিসকোর্স বা প্রভাব আরোপের মধ্যে। তার পরেও পুরুষতান্ত্রিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সার্বিক সমাজস্বীকৃত 'স্বাভাবিক' সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য 'জেন্ডার ইনফেরিওর' নারীর 'দায়'টাই যেন বেশি। বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ শব্দচয়ন থেকে শুরু করে ভাষা, সম্বোধন প্রায় প্রতিটি সমাজই নিয়েছে খুব সাধারণভাবে। 'ডিভোর্সি' শব্দটা একজন পুরুষের জন্য যতটা নেতিবাচক, তার থেকে শতগুণ বেশি নেতিবাচক একজন নারীর জন্য, যদিও অর্থগতভাবে শব্দটি দুইয়ের ক্ষেত্রে একই।

'একজন নারী তালাকপত্রে সই করল! কেন সে আরেকটু চেষ্টা করল না সংসারটি রক্ষার জন্য!' 'এই সমাজে একজন স্বাধীন নারীর একাকী জীবন কত ভয়ংকর! কে দেখে রাখবে তাকে? আবার কে বিয়ে করবে এই নষ্ট মেয়েকে?' কিংবা আরও ভয়ংকরভাবে, 'স্বামীর

নির্যাতন আর কিছুদিন সহ্যই করা যেত, যতই হোক পুরুষ তো, রাগ একটু বেশি থাকবেই!'... এই বাক্যগুলো প্রতিটি সমাজের প্রায় প্রতিটি নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদিও আর্থিক সামর্থ্য ও পদমর্যাদাভেদে প্রয়োগে একটু রকমফের হতে দেখা যায়। দুঃখজনকভাবে এ সংক্রান্ত আলোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের তথাকথিত বিবেকবান ব্যক্তিরা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। যাতে মনে হয়, সম্পর্ক রক্ষার গুরুভার কেবল একজন নারীর।

কেন এই অলিখিত বিধান শুধু নারীর জন্যেই : ফুকোর ক্ষমতার রাজনীতি এবং এঙ্গেলসের সম্পত্তির সূত্রপাত

যখন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোনো সমস্যা খতিয়ে দেখা হয়, তখন আগেই বোঝা প্রয়োজন সেই সমাজ কাঠামো এবং সেখানে বিদ্যমান সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলো। আমাদের এই প্রবন্ধের সমস্যা এবং প্রশ্ন হলো কেন একজন নারী বা মেয়েকেই প্রেম, বৈবাহিক কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক সঠিকভাবে পরিচালনা করার দায়ভার দেওয়া হয়। এক বাক্যে এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

একটি সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকে। সমাজবিজ্ঞানীরা যদি এই সমাজকে পরিপূর্ণ একটি মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে সেখানকার বহুবিধ প্রতিষ্ঠান শরীরের একেকটি অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। সমাজকে সুষ্ঠুভাবে জিইয়ে রাখতে হলে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন ভেবে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঠিকভাবে কাজ করা প্রয়োজন। কিন্তু আদতে কি তা হয়?

বাস্তবতা বলে যে, আমাদের সমাজ এবং এর প্রতিটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পরিবার থেকে শুরু করে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, অর্থনীতি কিংবা রাজনীতি সবই। যেখানে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে পরিসংখ্যানের বিভিন্ন মাত্রা তুলে ধরা হয়, সেখানের সেই ক্ষমতায়িত নারীটিও অনেক ক্ষেত্রে ফুকোর পাওয়ার পলিটিক্সের প্রান্তে অবস্থান করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, পরিবারের রীতিনীতি থেকে শুরু করে প্রতিদিনকার শব্দচয়ন, পোশাক এমনকি তার রং, শৈশব থেকে ছেলেমেয়েদের খেলনার ধরন নির্ধারণ করে দেওয়া, সবকিছুই আমাদের মনোজগতে খুব সূক্ষ্মভাবে এই ডিসকোর্স বা বিধিনিষেধগুলো প্রবেশ করিয়ে দেয়। আমরা আমৃত্যু এসব মেনে চলি। কেউ সবটা, কেউবা একটু কম। পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামো পোশাক পরিচ্ছদের মতো এও নির্ধারণ করে দেয় যে, সংসার কিংবা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য একজন নারীকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা তথাকথিত 'ছেলেরা একটু রগচটা হবেই, ঘর সামলানোর দায়িত্ব তো মেয়েদেরই'; 'প্রেম করেছ ছাড় তো তোমাকেই বেশি দিতে হবে'; 'যতই পড়ালেখা করো স্বামী এবং সন্তান আগে'... এসব জ্ঞানভারে পূর্ণ কথা আমরা হামেশাই শুনে থাকি আমাদের খুব কাছের

প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকে। এই বাক্যগুলো একইসঙ্গে নারীকে বলে দেয় তাকে সহনশীল হতে হবে চরম পর্যায়েও (রামের স্ত্রী সীতা সহ্য এবং সহনশীলতার পরীক্ষা দিয়েও শেষ রক্ষা পায় নি), আবার ছেলেশিশুকে বুঝিয়ে দেয় দায়দায়িত্বহীন ভবিষ্যতের কর্তাব্যক্তি একমাত্র সে-ই। আমরা দেখি যথেষ্ট যোগ্য এবং শিক্ষিত নারীও যদি তথাকথিত বয়সের সীমা পেরিয়ে যায়, তাহলে তাকে যে কোনো গোছের একজন পাত্রের কাছে সঁপে দিলেই পরিবার, ধর্ম এবং সমাজের কর্তব্য মিটে যায়। যোগ্য নারীটিকে অপাত্রে পড়েও আবার প্রতিনিয়ত পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যে। কত উপায়ে সে তার শ্বশুরপক্ষের লোকদের মনোরঞ্জন করবে সে নিয়ে তাকে সবসময় ভাবতে হবে। সারাদিন করপোরেট অফিস শেষে বাসায় ফিরে খাবার রান্নার কাজটা তাকেই করতে হবে। কেননা খাবারের স্বাদের ওপর সার্টিফিকেট দেবেন তার শ্বশুরপক্ষ। অথচ খাদ্য তৈরি বা দৈনিক গৃহস্থালি কাজের কিন্তু নারী-পুরুষ ভাগ নেই। এসব কাজের সবটাই সবার জন্য। কাজেই সংগত হলো গার্হস্থ্য কাজ নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে ভাগ করে করা।

সভ্যতার শুরুতে অগ্রগামিতায় নারী ছিল পুরুষের সমকক্ষ। জার্মান দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর মতে, তখন থেকে এই হিসেব পালটে যেতে থাকে, যখন সমাজে সম্পত্তি ধারণার সূত্রপাত হয়। তখন থেকেই পুরুষকুল নারীকে দেখতে শুরু করে সন্তান উৎপাদনের 'যন্ত্র' হিসেবে। আর এই ধারা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে আরও প্রবল হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠিত ধারণার আওতায় সংসারমুক্ত কোনো প্রেমের সম্পর্ক হলে সেখানেও দায়দায়িত্ব ও গঞ্জনার ভার নারীরই বেশি।

সাইকোলজিক্যাল সায়েন্সের একটি স্টাডি এবং স্টুয়ার্ট হলের রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একটি কলামে ২০১০ সালে পরিচালিত সাইকোলজিক্যাল সায়েন্স'র একটি স্টাডির কথা তুলে ধরা হয়। সেখানেও একইভাবে এই পুরুষতান্ত্রিক প্রথা ও ব্যবস্থার কথাই বলা হয়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে পরিবার, ধর্ম ও সমাজের আবদকেতা আমাদের শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়, 'মেয়ে তোমাকে সহনশীল হতে হবে। কেননা এটি প্রকৃতিপ্রদত্ত'। প্রকৃতিকে ব্যবহার করে শব্দচয়ন বা বাক্যগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এর বিপরীত অজস্র প্রমাণও কিন্তু রয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার কলামে নির্দিষ্ট করে গণমাধ্যমের উপস্থাপনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা যদি একটু সূক্ষ্মভাবে দেখার চেষ্টা করি তবে দেখতে পাব বেশিরভাগ বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমাতেই খামখেয়ালি, অগোছালো, রগচটা, শুধুই করপোরেট জগতে দায়িত্বশীল পুরুষ চরিত্রদের দেখতে পাই। আবার এরাই কিন্তু গণমাধ্যমভুক্ত আধেয়ের নায়ক কিংবা 'সুপারহিরো'। আর বিপরীতে খুবই পরিপাটি,

দায়িত্বশীল, স্নেহশীল, মমতাময়ী, ধৈর্যশীল, অন্যকে খুশি করার মতো চরিত্র দেখতে পাই নারীদের জন্য।

এমনতর উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে আমাদের চলচ্চিত্রগুলোয়। এমনকি পার্শ্ববর্তী ভারতের বলিউড এমনকি হলিউডেও। সেখানে নায়কের পৌরুষ প্রকাশ পায় অধিক সংখ্যক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে। বিপরীতে নায়িকাকে উপস্থাপন করা হয় এই নষ্ট নায়কের জন্য 'সতী' হয়ে থাকার প্রতীক্ষায়।

নারীদের এমনতর উপস্থাপনকে সমাজতাত্ত্বিক স্টুয়ার্ট হল সংজ্ঞায়িত করেন 'রিপ্রেজেন্টেশন' তত্ত্বের আলোকে। বিভিন্ন ভাষা, চিহ্ন, ছবি ও বস্তুর মাধ্যমে যে অর্থ আরোপ করার চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টাটি করে আমাদের সমাজ। আর যুগের পর যুগ এই ধারা টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতার রাজনীতি চালানো হয় এই পুঁজিবাদী সমাজে। তাই তো আমাদের গণমাধ্যম কিংবা যে কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান নারীকে সর্বদাই সহনশীল, 'সতী' হিসেবে দেখাতে পছন্দ করে। নারীবাদী ব্রিটিশ চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক লরা মালভের মেইল গেইজ তত্ত্বের আলোকে বলা চলে, এর সবকিছুই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নির্মিত ও পরিচালিত। আর স্বাভাবিকভাবেই কর্তার আসনে পুরুষ যেখানে আসীন, সেখানে কর্তার সন্তুষ্টির জন্য নারীকে সহনশীল হতেই হবে, যার ক্ষুদ্রতম প্রয়োগ দেখা যায় সম্পর্কের দায়ভার মেটানোর মাধ্যমেও।

নাদিয়া নাহরিন রহমান শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস।
nichole.rahman@yahoo.com

তথ্যসূত্র

- Why Women Apologize and Should Stop, 23 June 2015, Sloane Crosley, The New York Times
- Laura Mulvey, `Visual Pleasure and Narrative Cinema'; Film, Theory and Criticism: Introductory Readings, Edited by Leo Braudy and Marshall Cohen; New York: Oxford up; 1999: 833-44
- Foucault, M., "The Subject and Power", In: Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4, pp. 777-795, The University of Chicago Press, Chicago: 1982 (1982)